যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা ও শিক্ষক উভয় ক্ষেত্রেই চাই গুণগত মান

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

গত মাসের শেষ সপ্তাহে মাছরাঙা টিভি প্রদর্শিত একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে তাদের মান যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যেসব উত্তর দেন তা থেকে বোঝা যায়, তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও প্রত্যাশিত মান অর্জন করতে পারেননি। সাক্ষাৎকারটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুশীলসমাজ হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারটিতে 'জিপিএ' ও 'এসএসসি'র অর্থ বলতে পারেনি। 'আমি জিপিএ-ফাইভ পেয়েছি'-র ইংরেজি করেছে: 'আই অ্যাম জিপিএ-ফাইভ'। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে পালিত হয় বলতে পারেনি। জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায়, তাও বলতে পারেনি। পিথাগোরাসকে ঔপন্যাসিক এবং জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার নাম বলেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প পড়েন দাবিদার একজন শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পের নাম বলতে পারেননি। কম্পিউটার এবং ফেসবুক ব্যবহারকারী এক শিক্ষার্থী হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কী তা জানেন না; বিজ্ঞান পড়া ছাত্র জানেন না নিউটনের সূত্র; আরেক শিক্ষার্থী জানেন না বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নাম। জিপিএ-৫ পাওয়া সব শিক্ষার্থীর মান নিঃসন্দেহে এমন না হলেও স্বীকার করতে দোষ নেই যে, শিক্ষার গুণগত মান কমেছে।

শিক্ষার্থীদের এ রকম মান হতাশাজনক। কিন্তু এজন্য তাদের দোষ দেয়া যায় না। দা-বঁটিতে ত্রুটির জন্য লোহাকে দোষ না দিয়ে যে কামার এগুলো গড়েছেন তাকে দোষ দেয়া উচিত। একইভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানের প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে তাদের দোষ দেয়া যাবে না। দোষ দিতে হবে সেসব শিক্ষককে যারা এসব শিক্ষার্থীকে পড়িয়েছেন। দোষ দিতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে, যার মধ্য দিয়ে এসব শিক্ষার্থী গড়ে ও বেড়ে উঠেছেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত মান অর্জন করতে না পারার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকরা দায়ী। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান তুলে ধরার সময় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতিগত দিক ও উপস্থাপন ভঙ্গিমার সমালোচনা করেছেন, তাদের মনে রাখতে হবে, চামড়ার নিচে লুকায়িত টিউমারের ওপর স্নো-পাউডারের মেকআপ দিয়ে আড়াল করা আহাম্মকি। পরিবর্তে, অসুখ বাড়ার আগে তার চিকিৎসা করা জরুরি। পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দিয়ে পাসের এবং জিপিএ ফাইভের হার বৃদ্ধির সরকারি প্রচেষ্টা যে একটি ভুল পলিসি তা স্বীকার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষক হলেই যে দাতা হাতেম তাই হতে হবে এমনটা ঠিক নয়। পরীক্ষার্থীর খাতা দেখার সময় শিক্ষক একজন বিচারক। বিচারক নির্দেশিত হয়ে কাজ করবেন কেন? শিক্ষার্থী যদি ৩২ নম্বর পান, তিনি তাকে ৩২ নম্বর দেবেন। যে শিক্ষার্থী ৬০ নম্বর পাবেন, তাকে শিক্ষকের ৫৯ নম্বর দেয়ার সুযোগ নেই। কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দিয়ে পাসের ও জিপিএ-ফাইভের হার বৃদ্ধি দেখিয়ে সরকারের বাহবা নেয়ার নীতি ভুল ও আত্মঘাতী।

শিক্ষাঙ্গনে এখন শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গে শিক্ষকদের মানেও ধস নেমেছে। শিক্ষকদের অনেককে এখন শিক্ষার্থীদের মান বাড়ানোর চেয়ে নিজ বিত্তবৈভব বাড়াতে অধিকতর মনোযোগী মনে হয়। সে কারণে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে কনসালটেন্সি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান, রিসার্চ প্রজেক্ট করা এবং সান্ধ্যকালীন কোর্সে পাঠদানে অধিক মনোযোগী মনে হয়। শিক্ষক নিয়োগে ছড়িয়ে পড়েছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। ভালো ছাত্র তৈরি করার মতো যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ না করে শিক্ষার্থীদের ভালো মান আশা করা বোকামি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি ভালো শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছি? স্কুল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া জরিপ করে দেখা যায়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শৃংখলা ও পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

> চলমান পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রভাষক নিয়োগ করা হয়। যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় নেন, সেখানে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নিয়োগ হয় কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে! দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতেই হয়তো এ ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার আগে লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা নেই।

এখানে এ প্রসঙ্গে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরা যদি যোগ্য ও দক্ষ না হন, তাহলে কেমন করে মানসম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরি হবে? সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধাবীদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসনের ঘাটতি ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কারণে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অনেক সময় প্রয়োজন না হলেও ভোটার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সেজন্য দেখা যায়, একেকটি বিভাগে যতজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর এসব নিয়োগে কম ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে মেধা যাচাই হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে দলীয় বিবেচনা তো ছিল এবং আছে, তার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ। আগে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ শোনা যেত; কিন্তু এখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এমন অভিযোগ উঠছে। এ বিষয়টি একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়ায় সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর একটি গবেষণা কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে টিআইবি গবেষকরা সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

চলমান পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রভাষক নিয়োগ করা হয়। যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় নেন, সেখানে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নিয়োগ হয় কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে! দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতেই হয়তো এ ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার আগে লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা নেই। অস্বীকার করা যাবে না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত সিলেকশন কমিটিগুলো শিক্ষকদের দলীয় বর্ণ পরিচয় বিবেচনায় নিয়ে গঠন করা হয়। এজন্য প্রভাষক নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে দলীয় বিবেচনা বেশি গুরুত্ব পায়। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় দুর্নীতি করার সুযোগ বেশি। এ পরীক্ষার কোনো রেকর্ড রাখারও ব্যবস্থা নেই। নিয়োগ কমিটির সদস্যরা চাইলে সহজেই কোনো প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ভালো বা খারাপ হওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রভাষক নিয়োগে খুব খারাপ মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার এবং খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েও চাকরি না পাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ দৃশ্যমান। তবে প্রভাষক নিয়োগকে দলীয় রাজনীতির চক্র থেকে বের করতে যে চেষ্টা হচ্ছে না এমন নয়। তবে সে প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে কই? একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি ব্যাপকতা পাওয়ার পর বর্তমান ভিসি মহোদয় এ ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যে ৪৯৯তম সিন্ডিকেট সভা প্রভাষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরির জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করে দেন। এ কমিটি ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ৬টি বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। ওই প্রতিবেদনের সুপারিশমালার এক নম্বরেই কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, ২৫ নম্বরের ক্লাস প্রেজেন্টেশন এবং ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা সর্বসম্মত সুপারিশ করে। এ সুপারিশটি প্রশংসনীয়, তবে এর সঙ্গে যদি কমিটি ডিজিটাল যুগে ক্লাস পেজেন্টেশনের ভিডিও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিত, তাহলে বিষয়টি আরও পোক্ত হতো। তা না হলে কেবল লিখিত পরীক্ষার খাতাই রেকর্ড হিসেবে থাকবে। সে ক্ষেত্রে ক্লাস প্রেজেন্টেশন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে দলীয় প্রভাব পড়তে পারে। ক্লাস প্রেজেন্টেশন ভিডিও করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে মূল্যায়নকারীরা অধিকতর নিরপেক্ষ ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে প্রেজেন্টেশন মূল্যায়ন করতেন।

পরিতাপের বিষয়, ক্লাস প্রেজেন্টেশন এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রভাষক নিয়োগের উল্লিখিত সুপারিশ কার্যকর না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৫০১তম সিন্ডিকেট সভায় গঠিত ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকে এ সংক্রান্ত পূর্বে উল্লিখিত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা চূড়ান্ত করে রিপোর্ট দিতে বলে। গত পৌনে চার মাসে নতুন কমিটি বার দুই বৈঠক করলেও এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। নতুন কমিটি যদি সুপারিশকৃত প্রভাষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা এবং প্রেজেন্টেশন বাদ না দেন এবং লিখিত পরীক্ষার খাতা এবং ক্লাস প্রেজেন্টেশনের ভিডিও ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে সে সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে এমন ব্যবস্থা না থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যবস্থা চালু করলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের স্বার্থে ক্রমান্বয়ে হয়তো এ নীতি অনুসরণ করবে। এমন হলে দক্ষ এবং যোগ্য শিক্ষকরা শিক্ষকতায় আসার সুযোগ পাবেন এবং তাদের মানসম্পন্ন শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যোগ্য গ্রাজুয়েট তৈরি করতে পারবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত বিষয়টি ঝুলিয়ে না রেখে যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর তা না করে পুরনো মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখলে দলীয় প্রভাবে অযোগ্য প্রার্থীদের অবৈধ আর্থিক লেনদেন বা দলীয় প্রভাবে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা যাবে না। আর এমনভাবে শিক্ষক নিয়োগ হলে যুগপৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মান কমতে থাকবে। তখন অপারেশন সার্চলাইটের অর্থ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে মাছরাঙা টিভির বহুল আলোচিত সাক্ষাৎকারে জনৈক শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তরের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীও যদি বলেন, অপারেশন করার সময় যে লাইট জ্বালানো হয় সেটাই অপারেশন সার্চলাইট, তাহলে কেউ আশ্চর্য হবেন না। প্রেজেন্টেশন এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিয়োগ ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপ করে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মান সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com